এইসময়
সংবাদপত্র

* কথাসরিৎ *

জলের উচ্ছ্বাসে কোটি গলার ডাক/ আমাকে তোলপাড়
করেছিল,/ আমি পৃথিবীর আলোয় ঘুরে/ অদৃশ্য তট
আর আমার দোসরদের কথা ভেবেছিলাম।
— অরুণ মিত্র

পুং-তন্ত্র

অবশেষে। দীর্ঘসূত্রিতার ধারা ভেঙে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল ধর্ষণ-বিরোধী বিল। একই সঙ্গে সংযোজিত হল বেশ কয়েকটি 'পরিবর্তন', যেগুলি নিঃসন্দেহে আইনটিকে 'কড়া' বলেই প্রমাণ করে। কাকে যৌন-হেনস্থা বলা হবে, কাকেই বা ধর্ষণ, কোন কোন অপরাধ শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে— এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যে ধূসর বা অস্পষ্ট একটা ক্ষেত্র ছিল, সেটাও অনেকটাই স্বচ্ছ করা সম্ভব হয়েছে এই আইনে। যেমন, এই প্রথম অ্যাসিড ছোড়া-কে অপরাধ বলে গণ্য করল সরকার। সাজা কমপক্ষে ১০ বছরের কারাদণ্ড। শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় এল পিছু নেওয়া ও কুদৃষ্টি। যৌন নিগ্রহের এফআইআর নিতে অস্বীকার করলে সংশ্লিষ্ট থানার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া যাবে এই আইনের বলে। পুলিশকর্মী, সরকারি কর্মী, সেনা ও হাসপাতালের কর্মীরা দোষী প্রমাণিত হলে সাজা হতে পারে ৭ বছর থেকে জরিমানা-সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এ সব ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি 'পরিবর্তন' প্রমাণ করে, সরকার এ বার আইনের ফাঁসকে কোনও ভাবেই শিথিল করতে চায় না। দিল্লির মেয়েটির গণধর্ষণ ও মৃত্যুর পর সামাজিক স্তরে যে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন, এক ধরনের বিক্ষোভ ও উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তার আঁচ থেকে বাঁচতে সরকারি ভাবে এই ধরনের একটা কঠোর ব্যবস্থা নিতেই হত।

আইনের সংশোধন নিয়ে বাদানুবাদ, সহবাসে সম্মতির বয়স ১৬ হবে নাকি ১৮, 'কুদৃষ্টি'কেও অপরাধের আওতায় আনা হবে কি না, এইসব নিয়ে যখন আলোচনা চলছে মন্ত্রিমহলে, তখনও কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা থেমে থাকেনি। শহরে-গ্রামে-মফস্‌সলে একের-পর-এক মেয়েকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে। বাদ যাননি বিদেশের পর্যটকরাও। কয়েক দিন আগেই মধ্যপ্রদেশের দাতিয়ায় গণধর্ষণের শিকার হন এক সুইস পর্যটক। মঙ্গলবার সকালে আগ্রার একটি হোটেলের তিন তলার একটি ঘরের জানলা থেকে ঝাঁপ দেন এক ব্রিটিশ পর্যটক। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে যৌন হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছিল। নিজেকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে হোটেলের জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেন তিনি। পাশাপাশি, খুব সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, আইনের এই নতুন ফাঁস আদতে 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' নয় তো? প্রশ্ন জাগে এইজন্য, আইনের বিভিন্ন শর্ত ও সংযোজন নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যে ভাবে ভাব ব্যক্ত করলেন, অবশ্যই অবসরের মেজাজে, তাতে অন্তত এইটুকু বোঝা গেল, আইন-ই হোক আর যা-ই হোক, পুং-মানসিকতায় কোনও পরিবর্তন হল কি? প্রবল হাস্য ও রসালাপের ভঙ্গিতে সংযুক্ত জনতা দলের সভাপতি শরদ যাদব বলেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যিনি কোনওদিন কোনও মেয়ের পিছু নেননি?'

এবং ঠিক এই জায়গা থেকেই আভাস পাওয়া যায়, নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়াও কেমন হতে পারে। মনে রাখতে হবে, মন্ত্রীমশাইরা কেউই ব্যক্তিগত ভাবে মতামত পেশ করেননি, করেছেন খাস সংসদে বসে, তাঁদের 'মন্ত্রী' পরিচয়ের মুখটুকু নিয়েই। মুলায়ম সিং যাদব এমন মন্তব্যও করেছেন, 'এই আইনের কোনও প্রয়োজনই নেই, এতে পুলিশের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল... ' এরপর মেয়েদের চাকরিতে বহাল করা কিংবা কো-এড স্কুলে মেয়েদের পাশে ছেলেদের পড়তে পাঠানো নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে সংসদের মস্করা-পর্বে। সমস্যার গভীরে প্রবেশ না-করে কিংবা সমস্যার মূল তাৎপর্য অনুধাবন না-করে নিছক আইন প্রণয়ন আদৌ কোনও রূপান্তর আনতে পারবে কি? মন্ত্রীকুলের মন্তব্যে এই আশঙ্কাটাই তৈরি হয়। যে-কথা তাঁরা আলোচনা করেছেন, অনেক ভারতবাসীও হয়তো একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা দেখবেন। আরও বেশি উপহাসের পাত্রী হবেন মেয়েরা। মহিলাদের আসল সঙ্কটটা এ বার সম্ভবত ভাল ভাবে বিবেচনার মধ্যে আনার প্রয়োজন হয়েছে।

ক্রেতা স্বর্গ

আর ঠকে শেখা নয়। তাছাড়া ঠকে ক'জনই-বা শেখেন? শিখলেও এমন সময়ে যখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। তখন শুধুই আফশোস। বলা হয়, শেখার কোনও বয়স হয় না। তবে তো জীবনে চলার পথে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সবার শুরুতেই জানা উচিৎ। কিন্তু অনেক সময় সেসব সুযোগের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় না বলেই সহজ জিনিস কঠিন মনে হয়। অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। 'যদি এমন একটা সুযোগ পাওয়া যেত' ভেবে মনে ছটফটানি হয়, অথচ নিয়মপুস্তিকায় সে সুযোগ সত্যিই ছাপাহরফে জ্বলজ্বল করছিল। শুধু সুযোগ হয়নি সেই পাতা উল্টে দেখার, কারও কাছ থেকে জেনে নেওয়ার। যদি হতো তবে অধিকারটা সাংবিধানিক নিয়ম-কানুনের দ্বারা ইতিমধ্যেই সুরক্ষিত জেনে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেত। লড়াই চালানো যেত। নাকের ডগা থেকে কেউ লাখ টাকা উসুল করতে পারতো না—তাও মরা হাতি বেচে!

সচেতন ক্রেতাই সুরক্ষিত ক্রেতা। সচেতনতার সেই সুরক্ষাকবচ যদি শৈশবেই দেওয়া যায়? অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব? সেই আশাতেই স্কুলে স্কুলে 'কনজিউমার্স ক্লাব' গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। লক্ষ্য হল, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রেতার অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক প্রাথমিক পাঠ প্রদান। নানা প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বাড়ানো হবে তাদের সচেতনতা। যে কোনও সামগ্রী কেনার আগে 'এক্সপায়ারি ডেট', 'বেস্ট বিফোর ডেট', 'এমআরপি' প্রভৃতি দেখে নেওয়া, কোন সামগ্রীর জন্য কোন মার্ক প্রযোজ্য তা জেনে নেওয়া জরুরি। অথচ পণ্য ক্রয়ের পর প্রাপ্ত রসিদটিকে সামান্য জ্ঞান করে ছিঁড়েই ফেলা হয়। বা অযত্নে রক্ষিত সেই চুক্তিপত্রটি একদিন বাড়ির বাইরে ঠাঁই পায়—আস্তাকুঁড়ে। অথচ পণ্য বা পরিষেবার ত্রুটি সংশোধনে, মূল্য ফেরতে, ক্ষতিপূরণের মতো যে কোনও বিবাদ নিষ্পত্তিতে সেই ক্ষুদ্র তবু তুচ্ছ নয় রসিদটিই হতে পারতো ক্রেতা সুরক্ষার অস্ত্র। যে ব্যক্তি নিজেই নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, সে কীরূপে অন্যের অধিকার রক্ষার জন্য সরব হবে ?

সাম্প্রতিক অতীতে সচেতনতাকেন্দ্রিক অনেক অভিযানই বড়দের মধ্যে আগে পরিচালিত হয়েছে, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এ থেকে লাভবান হয়। স্মরণ করা যেতে পারে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সময় বহুল প্রচারিত স্লোগান 'সাক্ষর মায়ের সন্তান নিরক্ষর থাকে না'। সফলতার গভীরতা পরিমাপের সময় হয়তো এখনও আসেনি। কারণ উদ্যোগগুলি সময়ের বিচারে অনেকটাই নবীন। তবে ভাসা-ভাসা যে ধারণা পরিবেশ পরিস্থিতির নিরিখে পাওয়া যায় তাতে বলাই যায়, পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট সচেতন নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠছে বর্তমান নবীন প্রজন্ম। এই প্রজন্ম সায়েন্স ক্লাবের সভ্য হতে ভালবাসে। ক্ষুদে বয়সেই বিজ্ঞানের মডেল বানিয়ে অন্যদের তাক লাগায়। পথনিরাপত্তা থেকে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা—বড়রাও এদের জ্ঞানের কাছে হার মানে। দোকান-পসারে কেনাকাটা এমন একটি বুনিয়াদি বিষয় যা প্রতিটি মানুষের জীবনে অপরিহার্য। অনেকের কাছেই প্রক্রিয়াটি দোকানে নগদমূল্য দিয়ে বস্তু খরিদ করে বাড়ি ফেরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'ক্রেতা' ও 'ভোক্তা' ধারনা দুটির মধ্যে যে অধিকারকেন্দ্রিক সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান, তা প্রায়শই নজর এড়িয়ে যায়। এর জন্য দায়ী উপভোক্তা ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলনের অধিকার বিষয়ক অজ্ঞতা। সেই অজ্ঞতা দূরীকরণের লক্ষ্যে, রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর একেবারে বিদ্যালয় পড়ুয়াদের মহলে সচেতনতাবৃদ্ধির প্রয়াসে উদ্যোগী হয়ে সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছে।

* অসংখ্যা *

২০০০০০০০০০

(দু' শো কোটি)
মানুষ সারা দুনিয়াতে পরিশুদ্ধ জল পান না

* দিনকেদিন *

২১ মার্চ

১৬০২: ওলন্দাজ বণিকেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে।
১৮৩৬: কলকাতায় সর্বপ্রথম জনগণের জন্য গ্রন্থাগার 'পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯১৬: সানাই বাদক উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ জন্মগ্রহণ করেন বিহারের বক্সার জেলার ডুমরাঁও গ্রামে।
১৯২১: জাতীয় পতাকা হিসেবে কংগ্রেসের চরকা দেওয়া ত্রিবর্ণ পতাকা গৃহীত।

জলাভূমি বাঁচিয়ে রাখলে মাটির তলার জলও বাঁচবে

'জল ধরো, জল ভরো' এই উপযুক্ত আহ্বানের আড়ালে দমাদ্দম বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে জলাভূমি। রাতারাতি। বিশ্ব জল দিবসের প্রাক্কালে লিখছেন

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

কাল ২২ মার্চ, পৃথিবীর অনেক জায়গায় জলের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা হবে। অনেকটা নিয়মমাফিক হলেও এই কথোপকথন একেবারেই অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন নয়। আসলে, এই ধরনের দিনগুলির কাজ হল ফিরে দেখা। কিন্তু সমস্যা এখানে নয়। কারণ, ফিরে দেখা বলতে স্পষ্টত কিছু বলা হয় না। কে ফিরে দেখছেন তার উপরেই কি ফিরে দেখা হবে তাই নির্ভর করে। দুধের দরে বোতলবন্দি পানীয় জলের কারবারির ফিরে দেখা আর কুয়োর পাড়ে বিতাড়িত ক্যানালের জল খেয়ে বেঁচে থাকা পুরুলিয়ার কল্যাণপুর গ্রামের সবর পরিবারের ফিরে দেখা এক হতে পারে না। অন্তত এই অসঙ্গতিটা মেনে নেওয়ার সততা রেখে শুরু করতে পারি।

ক'দিন আগে (৩-৪ মার্চ) রাজধানীতে হ্যাবিট্যাট সেন্টারে জলের উপর একটি জাতীয় স্তরের আলোচনায় বসতে পারার সুযোগ হয়েছিল। কমপক্ষে ৫০ জন বিশেষজ্ঞ যাঁদের অনেকেই কিছুদিন যাবৎ জল নিয়ে কাজ করে আসছেন, যাঁদের কাজ সুপরিচিত, হাজির হয়েছিলেন দু'দিন ধরে নিজেদের কথা বলার জন্য। শুনতে ভালো লেগেছিল রাজেন্দ্র সিং-এর উপস্থাপনায় রাজস্থানের আলোয়ারে সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে অসামান্য জল সংরক্ষণের কাজ হয়েছে। আরও ভালো লাগত যদি উনি বলতেন যে কোথা থেকে পেয়েছিলেন তাঁর এই কাজের উৎসাহ। আর একজন মানুষ, এদেশের জল নিয়ে যারা ভাবেন, তারা তাকে এক ডাকে চেনেন। অনুপম মিশ্রজী তার অননুকরণীয় হিন্দিতে ১৯৯৫ সালে লিখেছিলেন 'রাজস্থান কে রজত বুন্দে'। গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটিই ছিল রাজেন্দ্র সিং-এর চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি। আমরা অনেকেই যে রাজ্যটিকে খরা কবলিত, মূলত মরু অঞ্চল বলে জানি, সেই দেশের ইতিহাসে কোনও দিনও জলাভাবের কথা আমরা কেউ শুনিনি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর সংস্কৃতির এক কল্পনাতীত মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর অন্যতম জল সংরক্ষণের ইতিহাস।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ কিন্তু সচেতন। ২০০৫ সালে 'ওয়াটার— এ শেয়ার্ড রেসপনসিবিলিটি' নামক ৫৮৫ পৃষ্ঠার একটি নিবেদনে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে এই ধরনের জল সংরক্ষণের জ্ঞানের কথা, যা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জায়গায় টিকে আছে আজও, বা হারিয়ে গিয়েছে, বা হারিয়ে যেতে বসেছে। নিবেদনটিতে আক্ষেপ করা আছে যে পরিকল্পনাবিদেরা কিছুতেই এই ধরনের জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিকে আমল দিতে চান না। অথচ দুনিয়াজোড়া জলের কান্নাকাটি সামাল দিতে এই পরীক্ষিত জ্ঞানসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের ইতিহাসের অহঙ্কারের পাতাগুলো পায়ে মাড়িয়েই আমরা বাণিজ্যের লেনদেন শুরু করেছি জল সংরক্ষণের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি টাকা দিয়ে কিনব বলে। সম্মেলনে উপরাষ্ট্রপতি ঢুকতে-বেরতে আমরা নিয়ম করে দু'টো হাত সামনে রেখে খাড়া দাঁড়িয়ে 'জন-গণ-মন' শুনলাম। দেশের প্রতি শ্রদ্ধা আরও পাকা করলাম।

সম্মেলনে হাজির ছিলেন জল নিয়ে ব্যবসায় নামতে প্রস্তুত এমন সব উদ্যোগীরা। জলের ব্যবসা এদেশে প্রায় এক দশক হল দ্রুত গুরুত্ব পাচ্ছে। আগে ব্যবসা হত মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাজারে হাজির করে। এখন মানুষের কী প্রয়োজন তাও ব্যবসায়ীরাই ঠিক করে দিচ্ছেন। দখল নিচ্ছেন বিজ্ঞাপনের। সরকারি সিদ্ধান্ত আর পরিকল্পনা দপ্তরগুলি ওদের পাখির চোখ। আজ তাই দেখি আমাদের প্রিয় সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতাটাই তাঁরা কিনে নিয়েছেন। আরও আছে। একটি আমেরিকান ওয়েবসাইটে গত বছরের 'বিশ্ব জল দিবস'-এর নানান লেখায় দেখলাম খুব ভয় দেখানো হয়েছে জল নিয়ে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের কথা বলে। দূষিত জলের বিপদের কথা বলে। এটাই হল মাঠে নামার আগে গা-গরম করার পদ্ধতি। ভালো করে ভয় দেখিয়ে তারপরেই ঢুকে পড়া যাবে জলের ব্যবসা নিয়ে। বস্তুত ইউরোপের অনেকগুলি দেশে আর আমেরিকায় এখন খুব মহড়া শুরু হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জলের ব্যবসা নিয়ে ঢুকে পড়ার। এই সম্মেলনেও তার আঁচ পেলাম।

যে কোনও সম্মেলনে, তা সে যত বড়োই হোক না কেন, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা সম্ভব হয় না। তবুও, কিছু কিছু জিনিস বাদ না পড়া বা এড়িয়ে না যাওয়াই ভালো। আজকে ২০১৩ সালে আগামী দিনের জল সম্পদের উপর উন্নয়ন বা বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগামী সূচক কি প্রভাব ফেলতে পারে এই আলোচনা হতেই হবে। এই সম্মেলনে হয়নি। প্রায় কোথাও তেমন হয় না।

উন্নয়ন আর বৃদ্ধি, আমরা যা করে দেখাব বলে হাঁক-পাক করছি, প্রতিবেশী চিন তা করে দেখিয়ে, আরও কয়েক ধাপ বেশ এগিয়েও গিয়েছে। কী হাল হয়েছে চিনের জল-সম্পদের উপরে? ফিরে দেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিশ্চয়। কারণ, এই তো ক'দিন আগে হুয়াং-পু নদীতে, যে নদী সাংহাই শহরের পানীয় জল সরবরাহ করে, হাজার হাজার মরা শুয়োর ভেসে যাচ্ছিল। কারণ, এখনও অজানা। চিনের শহরগুলির শতকরা ৯০ ভাগ মাটির তলার জল দূষিত। সে দেশের জিয়োলজিক্যাল সার্ভের একটি রিপোর্টে এই খবর পাওয়া গিয়েছে। আরও আছে। এর মধ্যে তিন ভাগের দু'ভাগ শহরেই এই জল অত্যন্ত দূষিত।

মাঝে মাঝেই কয়লা আর রাসায়নিক শিল্পের থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য বয়ে আসায় নদীর মাছে মড়ক লাগে। শিল্প এগিয়ে চলে। এছাড়া জলের জোগানের উপরেও ভয়ানক টান পড়েছে। আগামী ৩০ বছরের মধ্যে চিনের ভূ-গর্ভস্থ জলের উৎস ফুরিয়ে যেতে পারে। আমরা চিনের তুলনায় পিছিয়ে। অর্থাৎ, এরই মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ জল যা আমরা মাটির উপরে পাই— নদী, পুকুর, জলাভূমি, জলাশয়— এই সমস্ত আধার থেকে, তা দূষিত হয়ে পড়েছে। ক'দিন আগে একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে এই সব জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। জলের আলোচনায় উন্নয়নের প্রভাব নিয়ে কোমর বেঁধে না নামলে আমাদেরও দুর্দশার অন্ত থাকবে না। ফিরেই যখন দেখছি, তখন আর্সেনিক দূষণের কথা বাদ দেওয়া ঠিক হবে না, ভারতের বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড জুড়ে আর্সেনিক সমস্যা প্রতিদিন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। আর্সেনিক কেবল খাবার জলে নয়, গবেষকরা ধানের মধ্যেও আর্সেনিকের খোঁজ পেয়েছেন। এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

আর্সেনিকের আলোচনা যদিও বা হয়, কিছুতেই হতে চায় না, আর্সেনিকের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য জলাভূমি সংরক্ষণের কি অপরিসীম গুরুত্ব তা নিয়ে। জলাভূমি বাঁচিয়ে রাখলে একদিকে যেমন সেই জলে চাষবাস হবে, তেমনই জলাভূমি মাটির তলার জল ভরাট করে। অথচ 'জল ধরো, জল ভরো' এই উপযুক্ত আহ্বানের আড়ালে দমাদ্দম বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে জলাভূমি। রাতারাতি। বনগাঁর সীমান্তে, ডানকুনিতে বা পূর্ব কলকাতায়। আজ থেকে কয়েকদিন আগে আমরা প্রায় লেখাপড়া না-জানা এক ব্রাহ্মণের জন্মদিন পালন করলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। উনি একটা কথা অনেক বার বলেছিলেন। বলেছিলেন মনে-মুখে এক হতে। হতে পারলে জল নিয়ে এত কথা লেখার সুযোগ পেতাম না। তবে এখনও অনেক বছর জল নিয়ে এ রকম লেখা লিখে যাওয়া যাবে। কোনও দায় নেই তো।

আগামী ৩০ বছরের মধ্যে চিনের ভূ-গর্ভস্থ জলের উৎস ফুরিয়ে যেতে পারে। আমরা চিনের তুলনায় পিছিয়ে। অর্থাৎ, এরই মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ জল যা আমরা মাটির উপরে পাই— নদী, পুকুর, জলাভূমি, জলাশয়— এই সমস্ত আধার থেকে, তা দূষিত হয়ে পড়েছে।

লেখক পরিবেশবিদ ও 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার'-এর উপদেষ্টা

স্প্লিট ওয়াইড ওপেন (১৯৯৯)

দেব বেনেগাল

ফারোক ধোন্দি'র লেখা এই ছবিতে দেখা গিয়েছিল মুম্বইয়ের প্রদীপের তলার অন্ধকার। মুম্বইয়ের বস্তির অজানা সব গল্প। অন্য কিছুর মতো সেখানে ছিল জল নিয়ে ব্যবসাও। 'ওয়াটার মাফিয়া' কুয়োর জল তুলে বেচত বড়োলোক পাড়ায়। ভবিষ্যতের দিকে স্পষ্ট আঙুল!

কোয়ান্টাম অফ সোলেস (২০০৮)

মার্ক ফরস্টার

২০০০ সাল নাগাদ বলিভিয়া উত্তাল হল 'কোচাবাম্বা ওয়াটার রিভল্ট'-এ। বিতর্কের কেন্দ্রে সেমাপা, কোচাবাম্বা শহরের জল সরবরাহের ভার যাদের উপর। একটি বাঁধ বানাতে, ওই সংস্থার বেসরকারিকরণ করে দেওয়া হয়। ফলে ক্রমবর্দ্ধমান জলকরের বিরুদ্ধে ছিল ওই অভূতপূর্ব প্রতিবাদ। এই ফিল্ম ওই বিদ্রোহ থেকে অনুপ্রাণিত। বন্ড-এর প্রতিপক্ষ এখানে ডমিনিক গ্রিন। যে একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে, বলিভিয়া'র জল সরবরাহ ব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়ে নিতে চায়।

সমান্তরাল

দীপা প্রসাদ

উচ্চমাধ্যমিক

গা মোচড়াতে মোচড়াতে শেষ বারের মতো এক আধলা কামড় বসিয়ে শীত মিলিয়ে গিয়েছে, তা হল বেশ কয়েকদিন। সোয়েটার, জ্যাকেট কিংবা মাথায় হিম পড়ার ভয়ে উলের বেখাপ্পা টুপি জাস্ট ডোন্ট কেয়ার। সিলিং ফ্যান দিব্যি চার এই ফুরফুরে। তবু কী ভাবে যেন হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড ঠান্ডা জলের আলটুসি একটা মণ্ড নাভির ঠিক পাশ থেকে ঘূর্ণি পাকিয়ে তুরন্ত উঠে যাচ্ছে গলা অবধি। ভিতরটা তখন লোডশেডিং নির্জন। হাওয়া হাওয়া একলা ফানুস। সরু দড়ির উপর দিয়ে দু'হাত টানটান হয়ে চলতে চলতে আঁকড়ে ধরতে চাওয়া একটা নিবিড় হাত। ঘড়ির কাঁটার আপনভোলা টিকটিক এবং ক্যালেন্ডারের অজস্র নীল রং একসঙ্গে জটলা পাকিয়ে বিট বাজিয়ে দেয়। সময়টা উচ্চমাধ্যমিক। সময়টা জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ। সময়টা... একটা আধা চেনা। প্রবল কী হবে কী হবে। কাফকা, ভাস্কর, ব্রেশট সাইড হইয়া যায় অতঃপর। শহরের তুলতুলে মসৃণ পেটে সটান পা দিয়ে থাকা তেজি গিটারের স্ট্রিং আলতো ভাবে বাক্সবন্দি করে রাখে আদরের ডি-মাইনরকে। তিরতির আঙুলে রোদ ঝিলমিল ফিসফিস। দেখা হবে, দেখা তো হবেই। কিন্তু এটা একটু মিটতে দে। তারপর তো সিনেমা, প্রিন্সেপ ঘাট, হেঁটে যাওয়া। রাত একটা একচল্লিশে ঝং করে টিবটিব মেসেজ। মনে আছে তো? মনে থাকে যেন। একের পর এক থাকে জানলা দিয়ে। ধুলো মেখে শুয়ে থাকে ঝাঁপ-পড়া আড্ডা। প্রিয় কবিতার ডায়েরি ক্যালকুলাসের গাবদা বই-এর তুরীয় মেজাজের সামনে কেমন যেন গুটিসুটি মিনি। আর ভাই! উচ্চমাধ্যমিক তো! হায়ার সেকেন্ডারি। ওই যে, কনসেনট্রেটেড এইচ-টু-এস-ও-ফোর নে পুরা বচপন জ্বালা ডালা...!

এই সব ছবি-টবির মধ্য দিয়েই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ডুব সাঁতার দেয়। হঠাৎ হঠাৎ ঘাই মারে। গ্লাসের তলানির জলটুকু অযথা পড়ে থাকে দু'একটা মৃত মশা এবং শিবঠাকুরের ছবি পাশে রেখে। অন্ধকারে আধখাওয়া স্বপ্নকে জড়িয়ে নিয়ে নিদারুণ আলস্যের পাশ ফেরা আর সম্পূর্ণ হয় না তার। অ্যালার্ম বেজে উঠেছে।

মিনিবাসের পেটের ভিতর সেঁধিয়ে রয়েছে সে। আপনার বা আমার পাশে। যার পাশেই বসুক না কেন, আমরা তাকে দেখছি। দেখে চলেছি স্পষ্ট কিংবা আড়চোখে। তেলতেলে পরিপাটি চুল। কপালের দই-এর ফোঁটা এর মধ্যেই ঘামে ভিজে দুষ্টু লোক... ভ্যানিশ। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে ফ্যালফ্যাল করে মানুষের হাঁকডাক, জেব্রা ক্রসিং।

আজকে দিনের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব নিবিড় নিয়মাধীন। সময়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে জেদ আসে। গুটুলি পাকানো মুখ বজ্রমুষ্টি হয়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রাস্তা পেরোয়। সিম্ফনির মতো দিক পরিবর্তন করে ট্রামগুলো শ্লেষ্মা টানতে টানতে। ঘাড়ের উপর দু পা ছড়িয়ে তুমুল চাপ দিয়ে বসে থাকে কেমন হল? কত হবে? নাইনটি পার্সেন্ট তো... স্কুলের পেটের সামনে ডিও-মাখা অভিভাবকদের ভিড়। ভিড় মানে একটা সঙ্কল্প। একটা জেদি চোখ। যেমন তাহরির স্কোয়্যার... শাহবাগ। বলেছিল বরুণদা। এটা ভিড় সেরকম কিছু না। অনেক কাটা কাটা, কে জানে। এই ভিড়ের কাছে একটা মানুষ ইজ ইক্যুয়াল টু কয়েকটা নাম্বার, সে জানে, পরীক্ষার পর এই ভিড়কে পাশ কাটিয়েই অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সময়ের ক্যাকফনি বদলে দিতে পারে ফুটপাথ... মাঝদুপুরেই। কথাটা মনে পড়তেই পরীক্ষা শুরু হওয়ার মিনিট পনেরো আগে খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে হেসে ওঠে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। অল্প একটু। মুচকি মতো...

অন্ধকারে আধখাওয়া স্বপ্নকে জড়িয়ে নিয়ে নিদারুণ আলস্যের পাশ ফেরা আর সম্পূর্ণ হয় না তার। অ্যালার্ম বেজে উঠেছে।

বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য

* বোধিবৃক্ষ *

গাহ দেব, জীবনের গান

সুধীর দত্ত

লজ্জাবনত যুবক-যুবতীরা বেদান্ত কুটিরে পা রাখতেই কেমন আশ্চর্য সপ্রতিভতায় জেগে ওঠে। এ যেন তাদের স্ব-গৃহ। 'এসো, এসো— এমনতর প্রীতিসম্ভাষণে নিবেদিত গোলাপ কুঁড়ি বা পদ্ম পাপড়ির মতো প্রভুজির সামনে খুলে যায় তাদের হৃদয়— যুগল। এখনো হয়তো বা তাদের সম্পর্কের উপর ছাপ পড়েনি সামাজিক সিলমোহরের। কী যায় আসে তাতে! কেননা বেদান্ত তো কোনও শুচিবায়ুগ্রস্ততা নয়, এ এক সর্বগ্রাসী সহজ সুন্দরতা। আর ভালোবাসা হল এমন এক রসায়ন যা হৃদয়কে পূত ও প্রশস্ত করে, শরীর ও মনকে বাঁকিয়ে দেয় ঈশ্বরের দিকে।

অধিকাংশ ধর্মগুরুরা ভালোবাসার ভিতর অবিমিশ্র আমিষতায় নাক টিপে দৌড় লাগান। কেননা দিব্যতা তাঁদের কাছে এক বায়বীয় তত্ত্ব, কাচের আড়ালে সুরক্ষিত এমন এক গোপনীয়তা যা মাটি ছোঁয়ামাত্র হয় উবে যাবে, নয়তো-বা ভেঙে পড়বে খানখান। কিন্তু কী লাভ তাতে, আমাদের মতো ধূলিকাদা মাখা সামান্য মনুষ্যের? শুদ্ধাচারী সাধু সন্ন্যাসীদের রহস্যময় পেটেন্ট হয়ে থাকুক তা। কিন্তু ধর্ম কি বস্তুত সে রকম কিছু? না, ধর্ম কোনো কুহেলি বা ভঙ্গুর কাচপাত্র নয়, বলেন প্রভুজী। ধর্ম তো আসলে আনন্দের দিকে অস্তিত্বের ফুটে ওঠা। আর এই ফুটে ওঠার জন্য যেমন চাই সৌরকিরণকণা তেমনি চাই মাটি ও সংলগ্ন জল বাতাস। জীবন এই দুয়ের সমাহার। ঊর্ধ্ব যেমন নেমে আসতে চাইছে অধঃ-র দিকে অধঃ-ও তেমনি নিজেকে মেলে ধরতে চাইছে ঊর্ধ্বপানে। এ যেন প্রাণ অপানের খেলা। জেনে না জেনে আমরা প্রত্যেকেই ফুটে উঠতে চাইছি আমাদের এই অন্নপ্রাণের আয়তনে। এই-ই আমাদের হয়ে ওঠা। এই অন্তঃ প্রেরণাই জৈব ধর্ম, তার সমূহ জীবত্বকে নিয়ে ও অতিক্রম করে। তাই তো, ধর্ম নামক তথাকথিত যান্ত্রিক কোনও উপার্জনের খোঁজে নয়, অধিকাংশ মানুষজন বিশেষ করে তরতাজা ফুটন্ত যুবক-যুবতীরা প্রভুজীর কাছে আসেন তাঁর ভালোবাসার টানে। আর কে না জানে এবংবিধ প্রেমবশ জীবমাত্রই জেনে না জেনে সেই পরমার্থের আধার ও অধিকারী, যদিও নিন্দুকেরা বলবেন, প্রেম-ভালোবাসা আবার কী? এ তো মায়াবশ মানুষের মধ্যে কামের খেলা, প্রকৃতির কুহক।

* প্রতি সম্পাদক *

প্রসঙ্গ রেজিনগর এবং নলহাটি উপনির্বাচন

সুমন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রেজিনগর— ইংরেজবাজার কংগ্রেস কিছু শিখল কি?' (০৫-০৩) শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়লাম। কংগ্রেস কিছু শিখেছে কি না জানি না, তবে লেখাটি পড়ে মনে হল গণমাধ্যমের বোঝায় এখনও কিছু ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। বাস্তবে এ রাজ্য কংগ্রেসের নতুন করে হারানোর মতো কিছু নেই। বরং আমরা আশ্চর্য হচ্ছি মুর্শিদাবাদ নদিয়ার সীমান্তে রেজিনগর এবং বীরভূম মুর্শিদাবাদ সীমান্তে নলহাটিকেন্দ্র উপনির্বাচনে ভোটের ফলাফল দেখে। ইংরেজ বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কৃষ্ণেন্দুবাবুর ব্যক্তিগত অনুগামীর সংখ্যা, সরকারি দল হিসেবে তৃণমূলের ছোট একটি নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক এবং বরকত সাহেবের উত্তরাধিকারীদের অতিরিক্ত পরিবারকেন্দ্রিকতার জন্য শহুরে ভোটারদের বিরূপতা এই উপনির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু রেজিনগর আর নলহাটিতে তৃণমূল চালিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে যা কি না উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক। এই ধারাবাহিকতা যদি রাজ্য স্তরে অব্যাহত থাকে তাতে হয়তো সরকার চালানো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সরকারের জনমতের কতটা প্রতিফলন ঘটবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। কেন না সাধারণত বিধানসভা উপনির্বাচনে সরকারের পক্ষে ভোট পড়ার প্রবণতা থাকে।

'ছেলেপুলেরা' কংগ্রেস এবং তৃণমূলের ঐক্য হলেও তৃণমূলের দিকেই ঝুঁকে থাকবে। সেটা আমরা বিভিন্ন পৌরসভা নির্বাচনে দেখেছি। বিশেষত, কলকাতায় দুই দলের জোট থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে কংগ্রেসে নির্বাচিত কাউন্সিলররা দলত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তাতে কংগ্রেসের নিজস্ব ভোটব্যাঙ্কটির খুব একটা হেরফের হয়নি। তৃণমূলের নীতি বা কর্মসূচি যা এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে সবটাই কংগ্রেসের নীতি যা কর্মসূচির সম্পূর্ণ বিপরীত।

কংগ্রেস উদার অর্থনীতি এবং দৃঢ়ভাবে অর্থনৈতিক সংস্কারে বিশ্বাসী। আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সম্ভবত অর্থনৈতিক সংস্কার ও উদারীকরণ এবং দারিদ্র দূরীকরণের দেশব্যাপী বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির

ভিত্তিতে জনগণের রায় চাইবে। কিন্তু ৭০-৮০ দশকে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি যে ধরনের অর্থনৈতিক কর্মসূচির কথা বলতেন বা রাজনৈতিক স্লোগান দিতেন বর্তমানে তৃণমূল সেই কর্মসূচিকেই অনুসরণ করছে। যদিও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে অন্তত সিপিআইএম বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ না হলেও অংশত ও সেই কর্মসূচিগুলো থেকে সরে এসেছে। বিশেষত এদেশীয় 'গর্বাচেভ' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আরও কতিপয় নেতৃবৃন্দ তো বটেই। এ ছাড়া সিপিআইএম সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির অনুসরণে উগ্র তৃণমূলের কেন্দ্র বিরোধিতা তো আছেই। কেন্দ্রে দ্বিতীয় ইউপিএ মন্ত্রিসভায় থাকাকালীনই প্রতি পদক্ষেপেই কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের তীব্র মতপার্থক্য এই বৈপরীত্যেরই প্রতিফলন। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তৃণমূলের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ এই ধরনের সম্ভাব্য জোটে রাজ্যবাসীর কোনও মঙ্গল সাধন সম্ভব নয় এবং সেই জোট স্থায়ীও হবে না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ সাম্প্রতিক কালে 'পতনের পরে ভারতীয় কমিউনিস্টরা কি পাল্টাবে?' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বেশির ভাগ নেতাদের বক্তব্য শুনে মনে হয় না যে তাঁরা আদৌ পাল্টাবেন। একবিংশ শতাব্দীতে একটি একদলীয় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব একবারেই অচল। স্বভাবতই ভুক্তভোগী ও রাজনীতি সচেতন পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে সিপিআইএম-এর গ্রহণযোগ্যতা আরও কমাই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিশ্বাসী দলগুলি নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মসূচি ও দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আলাদা ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাতে জনসাধারণের কোনও ক্ষতি নেই। তা ছাড়া রাজ্য স্তরে বিজেপি বা কংগ্রেসের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে তৃণমূলের জোটবদ্ধতায় কেন্দ্রে জোড়াতালি দেওয়া সরকার গড়তে সাময়িক সুবিধা ছাড়া সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেস বা বিজেপি-র কোনও লাভ হয়েছে এমন কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি।

তমালকান্তি দে, কলকাতা-৩৯

বানান শিখিবেন না!

বাংলা ও ইংরাজি ছাড়া মাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্য বিষয়ে বানান ভুল লিখলে, তার জন্য পরীক্ষার্থীদের নম্বর কাটা হবে না বলে ঘোষণা করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (০৭-০৩)। নির্ভুল বানান হল শুদ্ধ শব্দ বা বাক্য গঠনের প্রথম শর্ত। কোনও শব্দের বানান ভুল লেখা হলে, সেই শব্দ তথা বাক্য অশুদ্ধ হয়। ভিন্ন বানান যুক্ত শব্দের অর্থও বিভিন্ন হয়। আবার ভুল বানান যুক্ত শব্দ অনেক সময়ই অর্থহীন হয়। অশুদ্ধ বাক্য কখনও বা কোনও অর্থই প্রকাশ করে না। তাই ভুল বানান লেখা হলেও, তার জন্য কোনও নম্বর কাটা হবে না— এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে সঠিক বানান শেখার বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ মনোযোগী হবে না। যেন তেন প্রকারেণ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার বেশি দেখানোর জন্যই কি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এই সিদ্ধান্ত? এই ধরনের উদ্ভট সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটবে না তো?

আসফাক আহমেদ, দোস্তপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

চিঠি লিখুন এই ঠিকানায়— **প্রতি সম্পাদক**, এই সময়, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড,
ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, নবম তল, ৪১ এ, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ । ফ্যাক্স: ০৩৩-৬৬০৩১৩৭৮ ।ই-মেল: eisamay@timesgroup.com

নিজের মত জানান ফেসবুক-এ। লগ ইন করুন:
www.facebook.com/eisamay.com